পঁচাত্তরের ট্রাজেডি ও কিসিঞ্জার কানেকশন

আ ব দু ল মা ন্না ন

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে প্রধানত কার বা কাদের মদদ ছিল, তা নিয়ে নানা মত ও তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তবে অঙ্গুলিনির্দেশটা যায় প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও হেনরি কিসিঞ্জারের দিকে। কেউ কেউ ভারতের 'র' আর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সম্পৃক্ততার প্রমাণও খুঁজে পান। তবে পনেরোই আগস্টের কালরাত্রির ঘটনার পিছনে মূলত সিআইএ ও হেনরি কিসিঞ্জারের নিয়ন্ত্রণাধীন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল বলে বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও তথ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে বিশিষ্ট মার্কিন কলামিস্ট ক্রিস্টোফার হিচেনস-এর প্রণীত 'কদণ করধটফ মত ঔণভরহ ধ্রিধভথণর' গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে যে একটি বিশ্লেষণাত্মক পরিচ্ছেদ রয়েছে তা অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

গোড়া থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন কখনও তাদের চরম অনুগত রাষ্ট্র পাকিস্তান হতে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক প্রত্যাশা করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নিক্সন প্রশাসনের এই নেতিবাচক মনোভাব গঠন ও পোষণে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন সে সময়ের নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার। সারা বিশ্বে এক চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে কিসিঞ্জার ছিলেন তুলনাবিহীন। বর্তমানে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডালিজা রাইস।

২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতের বিভীষিকা আর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত মার্কিন কন্সাল জেনারেল আর্চার ব্লাড এবং তাঁর দফতরের কুড়িজন কর্মকর্তা ৬ এপ্রিল এই হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতা বর্ণনা করে ওয়াশিংটনে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। তারবার্তায় তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সরকারের গণতন্ত্র

ধ্বংস প্রক্রিয়াকে মার্কিন প্রশাসন নিন্দা না করায় সমালোচনা করেন। তারবার্তায় তাঁরা এও উল্লেখ করেন যে, যেখানে সোভিয়েত সরকার কড়া ভাষায় ইয়াহিয়া খানকে তাঁর পূর্ব পাকিস্তান নীতির জন্য সমালোচনা করেছে সেখানে ওয়াশিংটনের নিশ্চুপ থাকা অথবা ইয়াহিয়া খানের নীতিকে সমর্থন করা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার শামিল। তারবার্তাটি ওয়াশিংটন পৌঁছানোর পর পররাষ্ট্র দফতরের আরও নয়জন কর্মকর্তা তাতে স্বাক্ষর করেন।

আর্চার ব্লাড তারবার্তা প্রেরণ ছাড়াও নিজে সে সময় দূতাবাসের বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে ও হেনরি কিসিঞ্জারের জাতীয় নিরাপত্তা দফতরে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ২৫ মার্চের কালরাত্রির সূচনালগ্নেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ঢাকা হতে সকল বিদেশী সাংবাদিককে বহিষ্কার করে। তা সত্ত্বেও দু'একজন সাহসী সাংবাদিকের কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তা কর্তৃক পরিচালিত শতাব্দীর ভয়াবহতম হত্যাযজ্ঞের সংবাদ সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রচারিত হয়। এই সাহসী সাংবাদিকদের মধ্যে এন্থনি ম্যাসকেরিনহাস ('কদণ টযণ মত ঈটভথফটঢ়ণ্রদ') ও সাইমন ড্রিং (একুশে টেলিভিশন খ্যাত)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্লাড ও তাঁর সহকর্মীদের তারবার্তা প্রাপ্তির পরপরই নিক্সন ও কিসিঞ্জার দু'জনই ব্লাড ও তাঁর সহকর্মীদের ওপর মারাত্মকভাবে ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁদের এই 'ধৃষ্টতা'র জন্য জুন মাসের পাঁচ তারিখ ব্লাডকে ঢাকা থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশের সার্বিক প্রশাসন অতিদ্রুত বঙ্গবন্ধু তথা আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছিল, ছয়ই মার্চ ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জার তাঁর নিরাপত্তা কাউন্সিলের এক সভা আহ্বান করেন। ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জনসভার প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষতো বটেই, সারা বিশ্বের মানুষ আর পিন্ডির সামরিক জান্তা অপেক্ষা করছে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার জন্য।

৬ মার্চে অনুষ্ঠিত কিসিঞ্জারের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কাউন্সিলের একাধিক সদস্য এই মতপ্রকাশ করেন যে, ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে একটি সতর্কবাণী প্রেরণ করা সঙ্গত হবে। তাঁকে বলা হোক পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য। কিসিঞ্জার এই প্রস্তাবের সাথে প্রবলভাবে দ্বিমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে কিসিঞ্জারের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে সবসময় দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এক পর্যায়ে কিসিঞ্জার এমন মন্তব্যও করেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁকে চাপ দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রশ্নে পাকিস্তানের গৃহীত নীতির প্রতি সমর্থন দিতে আর তাঁর সহকর্মীরা ঠিক উল্টো মত প্রকাশ করছেন। এই ধরনের টানাপোড়েনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে তিনি একটি উন্মাদ আশ্রমে কাজ করছেন।

নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সব সময় ধারণা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুগত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার একটি রুশ-ভারত পরিকল্পনা। এই দু'জনই ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকারকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতেন চরম অবজ্ঞার চোখে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ইন্দিরা গান্ধীর ওয়াশিংটন সফরের সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে এক পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি হোয়াইট হাউস গেলে তাঁকে সেখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসিয়ে রাখা হয়। এটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান করার নিক্সন প্রশাসনের পূর্বপরিকল্পনার এক নির্মম বহির্প্রকাশ। বিশ্লেষকদের ধারণা, তাদের হৈ মনোভাবের অন্যতম কারণ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর পিতা পণ্ডিত নেহেরু, মার্শাল টিটো ও সোয়েকার্নো মিলে পশ্চিমা আধিপত্যবিরোধী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) সূত্রপাত করেছিলেন যা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতিবিরোধী।

১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব লাভ করার পরও ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি বরং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নিক্সন ও তাঁর গৃহীত মার্কিন নীতির পরাজয় ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কিসিঞ্জার তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় হিসাবে গণ্য করতেন এবং সময়মতো এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। কিসিঞ্জার ও নিক্সনের ঘৃণার তালিকায় অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্ত হয় বঙ্গবন্ধুর নাম। পররাষ্ট্র দফতরে তাঁর সহকর্মী রজার মরিসের তথ্য অনুযায়ী কিসিঞ্জার প্রায়শ বঙ্গবন্ধুকে চিলির আলেন্দের সাথে তুলনা করতেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সিআইএর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় চিলির নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দেকে জেনারেল পিনোশের বাহিনী এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করে। এ ছিল মার্কিন রাজনীতির এক কৃষ্ণ অধ্যায়।

১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জার পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ১৯৭১ সালে আর্চার ব্লাডের সঙ্গে যাঁরা ঢাকা থেকে তারবার্তা পাঠানোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের ভাগ্যে জোটে পদাবনতি। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে কিসিঞ্জার সে সাক্ষাতকারে উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানান। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করলে তাতে কিসিঞ্জার বাগড়া দেন। রজার মরিসের ভাষ্য অনুযায়ী, কিসিঞ্জার এ সময় এমন মন্তব্যও করেন যে বাংলাদেশ যেহেতু পাকিস্তানের মতো তাদের একান্ত অনুগত রাষ্ট্র হতে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশকে কিছুকাল নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

১৯৭৪ সালের নবেম্বর মাসে কিসিঞ্জার পূর্ব এশীয় দেশসমূহ সফরের সময় ঢাকায় আট ঘণ্টার এক যাত্রাবিরতি করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি তিন মিনিটের এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কেন তিনি সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বলতে অস্বীকার করেন।

কিসিঞ্জারের ঢাকা ত্যাগের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর লক্ষ্যে মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রটি ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ।

কিসিঞ্জার তাঁর ঘদর্ধণ ঔমল্রণ হণটব্র গ্রন্থে উল্লেখ করছেন, ১৯৭১-এর ৩০ জুলাই আওয়ামী লীগ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মি. কাইয়ুম (কাজি জহিরুল কাইয়ুম?) কোলকাতাস্থ মার্কিন কনস্যুলেটে যোগাযোগ করেন এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে তাঁর দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যোগাযোগের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। কিসিঞ্জারের বক্তব্য অনুযায়ী কাইয়ুম এমন তথ্যও দেন যে, শেখ মুজিবকে যদি মুক্ত করা হয়, তা হলে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি থেকে সরে আসবে। কনস্যুলেট থেকে পাওয়া তথ্যটি কিসিঞ্জার পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে অবহিত করেন। এ সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চরমভাবে মার খাওয়া শুরু করেছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত জোরালো হচ্ছিল। ইয়াহিয়া খান এক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় খুঁজছিল। আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কিছু মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও চরম সুবিধাবাদী ষড়যন্ত্রকারী কিসিঞ্জারের সহায়তায় ইয়াহিয়া খানকে এ সুযোগ এনে দেয়। কিসিঞ্জার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনায় ইয়াহিয়া খান অনেকটা রাজি হয়েছিল।

১৯৭১-এর সেপ্টম্বর মাসে মার্কিন সরকার খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৮ সেপ্টেম্বর মোশতাক কোলকাতাস্থ মার্কিন কনসালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের এ সকল অশুভ উদ্যোগ ফাঁস হয়ে গেলে সব কিছু ভেস্তে যায়। ১৯৭১ সালের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে কিসিঞ্জারের ঢাকা ত্যাগের পর যে ভয়ঙ্কর নাটকের মহড়া শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সরকার হয় সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল অথবা বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

১৯৭৫ সালের ভয়াবহ ট্রাজেডির পর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যে জানা যায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বুস্টার এ সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে শুধু অবহিতই ছিলেন না, এ সময় ঢাকায় অবস্থানরত সিআইএর স্টেশন

প্রধান ফিলিপ চেরির সাথে মেজর ফারুক, মেজর রশিদ ও আরও বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, এ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন।

১৯৭৬ সালে সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকেরিনহাসের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে ঘাতক মেজর রশিদ স্বীকার করে যে, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের প্রায় ছয় মাস আগে হতে মোশতাকের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলছিল। ঘাতকরা আর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক লরেন্স লিফস্লুৎজের (The unfinished Revolution) সঙ্গে অন্য এক সাক্ষাতকারে এ তথ্যও প্রকাশ করেছিল যে, তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে তারা যে শুধু মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত, তা নয়, আরও একজনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল–তিনি জেনারেল জিয়া। তাদের মতে জিয়া কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ঘাতকদের সঙ্গে মার্কিন যোগাযোগ ছিল নিয়মিত এবং কিসিঞ্জারের পররাষ্ট্র দফতর এই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, শেখ মুজিবের উৎখাতে কোন সমস্যাই হবে না। পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে অনেক ঘাতককেই যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে– সাধারণত যা তখন ছিল অসম্ভব।

১৯৮০ সালে মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্য স্টিফেন সোলার্জ সাংবাদিক লিফস্লুৎজের দেয়া বক্তব্য তদন্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে মুজিববিরোধীদের সঙ্গে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের যে যোগাযোগ ছিল, তা কেউই অস্বীকার করেনি।

অর্ধসত্য, মিথ্যা, বানোয়াট বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশে দেশে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা তার পররাষ্ট্র দফতরের যে, জুড়ি নেই, ১৯৭৩-এর চিলি, ১৯৭৫-এর বাংলাদেশ আর ২০০৩-এর ইরাক তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

[তথ্যসূত্র : ১. দি ট্র্যায়েল অব হেনরি কিসিঞ্জার–ক্রিস্টোফার হিচেন্স, ২. হোয়াইট হাউজ ইয়ার্স–হেনরি কিসিঞ্জার]